KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection : KLMLGK	Publisher : বিক্রম মুখোপাধ্যায়
Title : অগ্রিম	Size : 6"x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 2/1 2/2 2/3-4 2/5	Year of Publication : আশ্বিন, ১৩৮৭ কার্তিক, ১৩৮৭ অগ্রহায়ণ, পৌষ - ১৩৮৭ মাঘ, ১৩৮৭
	Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : বিক্রম মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ চৌধুরী	Remarks : No. of Page missing

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

পত্রিকা

সংস্কৃতি ও প্রগতির মাসিক মুখপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা | মাঘ, ১৩৪৭

বৃহত্তর বঙ্গের সীমান্ত সমস্যা

কালিদাস নাগ

বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতিত্বে বরণ ক'রে আমাকে আপনারা যে সম্মান দেখিয়েছেন সেজন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ১৯৩৩ সালে আপনাদের প্রয়াগ অধিবেশনেও সভাপতি ছিলাম। কিন্তু এই বিগত সাত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালীর অবস্থা ঘরে ও বাইরে এত শোচনীয় হ'য়েছে যে, এবার জামসেদপুর অধিবেশনে শুধু বাঙ্গলা সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা ক'রে আমাদের মন কোন সান্ত্বনা পাবে না জানি। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আজ যেন নিদারুণ জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। দুর্দ্দিনের এই ঘনান্ধকারের মধ্যে আমরা যেন এগিয়ে এসে পরস্পরের হাত ধ'রতে পারি, সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে পারি এই প্রার্থনা করি।

১৯২২ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনীর জন্ম হয়। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা তখন এক বৎসর হ'য়েছে এবং কবির আমন্ত্রণে ফরাসী দেশের বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত, আমার অধ্যাপক, সিলভ্যাঁ লেভী (Sylvain Levi) প্রথম আচার্য্য অতিথিরূপে শান্তিনিকেতনে আসেন। বাঙ্গলা দেশে অবস্থানের ফলে আচার্য্য লেভী প্রাক্-আর্য্য ও প্রাক্-দ্রাবীড় সভ্যতার ছবি বিদ্বৎসমাজে প্রথম উদ্ঘাটিত করেন, তাঁর বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ (The Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India) ও অন্য রচনার ভিতর দিয়ে। তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে Prof. Jules Bloch, Prof. J. Przyluski, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রভৃতি ক্রমশঃ তাঁদের গবেষণার ভিতর দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, পূর্ব্ব ভারতের প্রাক্-আর্য্য জাতি, মুণ্ডা, সাঁওতাল, প্রভৃতি সুদূর ইন্দো-চীনের প্রাচীন Mon-Khmer (মেন্‌খেমের) জাতির সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধে যুক্ত ছিল। বৈদিক যুগের পূর্ব্বেকার ভারতে এই প্রাক্-আর্য্য সভ্যতা ও ইতিহাসের ইঙ্গিত পাবার সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কার হয়, অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক মনীষার প্রভাবে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ থেকে ৬০০

শতকে ভগবান বুদ্ধের বিশ্বমৈত্রী প্রচার পর্য্যন্ত আমরা দেখি, বঙ্গ-মগধবাসীরা ভারতের ইতিহাসে তাদের স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা প্রতিষ্ঠিত ক'রেছে। প্রাক্-আর্য্য সভ্যতার সঙ্গে আর্য্য সভ্যতার মিলন ও সমন্বয়ই এই মৌলিকতার ভিত্তি। বিজয়ী আর্য্যদের সভ্যতা, রীতি ও নীতি আমরা নির্ব্বিবাদে মানিনি ব'লেই বোধহয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (খৃঃ পূঃ ১০০০) ও মহাকাব্যের যুগে আমাদের অর্থাৎ প্রাচ্য দেশের মানুষদের অবজ্ঞা করা হ'য়েছে ও "অন্ত্যজ" বলা হ'য়েছে। আমাদের দেশ নাকি "পাণ্ডববর্জ্জিত", অথচ এই প্রাচ্য খণ্ডের কত জায়গার সঙ্গে যে পাণ্ডবদের নাম ও স্মৃতি জড়িত তার ইয়ত্তা নাই। সভ্যতাকে এক ছাঁচে না ঢেলে শিল্পী বাঙ্গালী চিরদিন খুঁজেছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, অনৈক্যের মধ্যে সাম্য। তাই বোধ হয় যুগাবতার ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব হয় এই পূর্ব্ব ভারতের বুকে এবং এইখান থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সাম্য এবং মৈত্রীর অমর মন্ত্র, বঙ্গ-মগধবাসী চিরদিন সগৌরবে এই ইতিহাস স্মরণ কোরবে। আমাদের জাতীয় জীবন মহাভারতের এইত আদি পর্ব্ব। খৃঃ পূর্ব্ব ৫০০—১৫০০ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের যুগ থেকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের যুগ পর্য্যন্ত তেমনি আমরা খুঁজেছি বৈষম্যের মধ্যে সাম্য, সংঘর্ষের মধ্যে শান্তি। এই দুই হাজার বছর ধ'রে দেখেছি প্রাচ্য ভারতে এক অভিনব আদর্শবাদের বিস্তার এবং তার মধ্যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কামরূপ প্রভৃতি প্রদেশ পরস্পরের সহকর্ম্মী হয়ে, নিজ নিজ সাধনায় ও সম্পদে উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে আমাদের ইতিহাস।

মধ্যযুগের মোড় ফিরে আধুনিক যুগে পা দিয়ে আমরা দেখেছি সেই ইতিহাসেরই আর এক রূপ। ইরাণী ও গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ও সমন্বয় চ'লে আসে শক-যবন-কিরাত কম্বোজ সম্মেলনের ভিতর দিয়ে তুর্কী-পাঠান-মুঘল আক্রমণের যুগে। অথচ তার মধ্যে জেগেছে গুরু নানক, রামানন্দ, কবীর ও শ্রীচৈতন্যের মৈত্রী মন্ত্র। সেই মন্ত্র সম্বল কোরে আমাদের বাঙ্গলা দেশ (এখনকার বৃহত্তর বঙ্গ) আর এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন হোল। শ্রীচৈতন্যের যুগেই সুদূর পাশ্চাত্য জগতের প্রথম প্রতিনিধি পর্ত্তুগীজরা খুলে দিল এক নূতন বণিকতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের অধ্যায়। আবার সুরু হোল ইউরোপীয় জাতি সঙ্ঘের এক নিষ্ঠুর দোহন ও দাহন-নীতি, যার কোন তুলনা আমাদের প্রাচীন রাজনীতির মধ্যে মেলে না। পাশ্চাত্য জাতির অলক্ষ্য আক্রমণ সুরু হোল দক্ষিণ ভারত থেকে, কিন্তু তার সবচেয়ে বড় ধাক্কা লাগল বাঙ্গলা দেশের বুকে। খৃষ্টান পাদ্রীসঙ্ঘ বণিকশক্তি ও রাজশক্তি চেয়েছিল দেহ জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আত্মা জয় কোরতে। যান্ত্রিক যুদ্ধে পরাস্ত হলেও বাঙ্গালীরা এই ধর্ম্মযুদ্ধে পরাস্ত হয়নি এবং সমস্ত ভারতবর্ষের হ'য়ে বাঙ্গালী তার

আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা সগৌরবে রক্ষা ক'রে এসেছে। ১৬৩৩ সালে ইংরাজরা বাঙ্গলা দেশের বুকে আস্তানা গেড়ে বসেছিল, গোড়ে তুলেছিল কুঠির পর কুঠি, কত কল কত কারখানা। ২০০ বছরের উপর (১৬৩৩—১৮৩৪) বাঙ্গলা দেশই ছিল তাদের বণিকশক্তি ও রাজশক্তির কেন্দ্র। সুদূর মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হোত তখন বাঙ্গলার ইংরাজ শাসকদের নির্দ্দেশে। বাঙ্গলার নব-জাগরণের পুরোহিত রাজা রামমোহন রায় সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিনিধি হ'য়েই যেন একা সংগ্রাম ক'রে গেছেন—আমাদের স্বাতন্ত্র্য, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য। জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তাই বাঙ্গালী রামমোহনের যুগ একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে থাকবে, একথা ভারতবন্ধু সি. এফ. এণ্ডরুজ তাঁর কংগ্রেসের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস-এর সময় থেকে প্রায় ১০০ বৎসর ধ'রে বাঙ্গলা দেশেই বৃটিশ রাষ্ট্রতন্ত্রের যত ভাঙ্গা-গড়া চলেছে। সে এক সুদীর্ঘ জটিল ইতিহাস এবং তার মধ্যে এখন আমাদের প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

আমি আজ শুধু দেখাতে চাই যে, বাঙ্গলার সীমানা বারবার অদলবদল করার ফলে পূর্ব্ব ভারতে ও বিশেষভাবে বাঙ্গালীর জীবনে কি ভীষণ বিপ্লবের সূচনা হয়। ১৮৭৪ সালে আসামকে বিচ্ছিন্ন করা হোল, গোয়ালপাড়া শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের বাঙ্গালীরা হয়ে গেল অবাঙ্গালী এবং বাঙ্গলা ভাষার স্থলে অসমিয়া হোল রাজকীয় ভাষা। বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যা মিলে কিছুদিন চলল সেকালের বাঙ্গলার শাসনতন্ত্র, হঠাৎ ১৯০৫ সালে বাঙ্গলাকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে পূর্ব্ব বাঙ্গলাকে যুড়ে দেওয়া হোল আসামের সঙ্গে। ১৯১১ সালে যখন বাঙ্গালী আমলাতন্ত্রের খামখেয়াল জয় কোরে নিজের দেশকে সাময়িকভাবে এক ও অখণ্ড প্রমাণ কোরল, তখন থেকেই বাঙ্গালী হ'য়ে গেল "দাগী"। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী যুগের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে বাঙ্গালী জাগিয়ে তুলল নিখিল ভারতের জাতীয় আন্দোলন। একথা সহজে ভোলবার নয় এবং ভোলা যে যায়নি তার প্রমাণ গত ৩০ বছরের প্রচ্ছন্ন পার্টিশনের মধ্যে দেখতে পাই। একে একে বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর প্রভৃতি সুদক্ষ সার্জ্জেনের ছুরীতে কাটা গেল এবং আমাদের বোঝান হোল এই অস্ত্রোপচারের ফলে সকলেরই ভাল হবে, বিশেষ ক'রে বাঙ্গালীর। এর ভাল-মন্দের হিসাবনিকাশ পাকারকমে কর্ত্তে হ'লে অনেক পরিশ্রম ও গবেষণার প্রয়োজন। কংগ্রেসী যুগের অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে অধিকাংশই বলা যায় বাঙ্গালীর মহাভারতের "সভাপর্ব্ব", তার মধ্যে বেশীর ভাগই ছিল বক্তৃতা আর আবেদন ও নিবেদনের মেলা। খুব অল্পদিনই বাঙ্গালী বুঝেছে যে তার সর্ব্বনাশের "উদ্যোগ পর্ব্ব" তার অলক্ষ্যে রচিত হ'য়ে গেছে। সে যখন জেগে উঠেছে তখন

একবারে তার জীবন-মরণ সংগ্রাম সেটা "ভীষ্মপর্ব্ব" কি "মুষলপর্ব্ব" সেটা ভাববারও অবসর নেই। সম্মেলনের সাধারণ সভায় এসব বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা সম্ভব নয়। সম্মেলনকে প্রস্তুত হ'তে হবে এইসব সমস্যার আসল বিশ্লেষণ ও সমাধানের জন্য বাঙ্গালী ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিজ্ঞদের সাহায্য নেওয়া ও তাঁদের সাহায্য করা। কত কাজ করা বাকী আছে, যার জন্য কোন স্থির সিদ্ধান্তে আমরা আসতে পাচ্ছি না। তার একটু আভাষ দিতে আজ চেষ্টা কোরব। আমার বন্ধু অধ্যাপক রমেশচন্দ্র ঘোষ এই কাজে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য কোরছেন। ১৮৭০-৭১ সালে প্রথম সেনসাস থেকে সুরু কোরে ১৯৪০-৪১ এর সেনসাস্ পর্য্যন্ত বিগত ৭০ বছরের মধ্যে বাঙ্গলায় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক্ ও সামাজিক জীবনের কত পরিবর্ত্তন হয়েছে, বাঙ্গালীর ভাষা, ভাব ও সংস্কৃতি কিভাবে খণ্ডিত ও নিস্তেজ ক'রে ফেলা হয়েছে তার কিছু আভাষ আমরা দেবার চেষ্টা কোরব। বাঙ্গলার মেধাবী ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাব নেই, কিন্তু দারুণ অভাব ঘটেছে সাহচর্য্যে ও অর্থে। এতবড় জাতীয় দুর্দ্দিনে আশা করি সহকর্ম্মী মিলবে এবং আমাদের সহানুভূতি সত্য হবে, গভীর হবে।

কিন্তু শুধু সহানুভূতির বলে সব রকম সমস্যার সমাধান করা যায় না—চাই সামর্থ্য, চাই অর্থ। এই প্রসঙ্গে তাই আমার অভিভাষণ শেষ কোরতে চাই বৃহত্তর-বঙ্গ সংগঠনের একটু আভাষ দিয়ে। কংগ্রেস তার জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির কাজ প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন। বাঙ্গালী তা থেকে কতটা লাভবান হবে তা আমরা জানি না, তবে অনেক বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞ সেই কমিটিতে কাজ করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ আমাদের এই সম্মেলন সভায় উপস্থিত আছেন। তাঁদের এবং সম্মেলনের সভ্যদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, আমরা আজই এই শেষ অধিবেশনে "বৃহত্তর বঙ্গ সংগঠন কমিটি" গ'ড়ে তুলি। বন্ধুবর নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় আগেই বলেছেন, জামসেদপুর প্রধানতঃ "কেজো লোকদের" জায়গা। তাঁদের সাহচর্য্য পেলে আমরা আশা কোরতে পারি যে, আমাদের বৃহত্তর বঙ্গ শাখা শীঘ্রই সক্রিয় হবে ও ফলপ্রসূ হবে। জামসেদপুরে সম্মেলনের আঠার বছর পুরল; সুতরাং তাকে এখন সাবালক হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়বার ভার নেওয়া উচিত। তাই আপনাদের অনুমতিক্রমে এই শাখার প্রবন্ধাদি "পঠিত ব'লে গ্রহণ" ক'রে বৃহত্তর বাঙ্গলার সংগঠন বিষয়েই আলোচনা করা হোক। বাঙ্গালী জাতকে যদি ঘরে বাইরে আমরা সঙ্ঘবদ্ধ ক'রতে চাই তা'হলে আমাদের স্পষ্ট কোরে জানতে হবে বাঙ্গলা ভাষাভাষীদের অবস্থা আসলে আজ কোথায় দাঁড়িয়েছে। ১৮৭১-৮১ সনের দুটি সেনসাস রিপোর্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হয়নি, তবু মোটের

উপর নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সারা ভারতে বাঙ্গলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ৩৬,০০০,০০০—৩৮,০০০,০০০। সেই অনুপাতে পরবর্ত্তী সেনসাসে দেখছি:

১৮৯১	৪১,৩৪৩,৬৭২
১৯০১	৪৪,৬২৪,০৪৮
১৯১১	৪৮,৩৬৭,৯১৫
১৯২১	৪৯,২৯৪,০৯৯
১৯৩১	৫৩,৪৬৮,৪৬৯

শেষোক্ত সংখ্যা থেকে বর্ত্তমান বাঙ্গলার বাঙ্গলা ভাষাভাষীদের সংখ্যা ৪৬,৩৯৩,৮০২ বাদ দিলে বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭,০৭৪,৬৬৭। সুতরাং বৃহত্তর বঙ্গের এলাকা বড় কম নয়। সত্তর লক্ষেরও অধিক বাঙ্গালী নর-নারী আজ রাজনৈতিক খামখেয়াল বশে পড়েছে বাঙ্গলার বাইরে; তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও অন্নবস্ত্রের সমস্যা কি বিরাট ব্যাপার! প্রায় সমগ্র অষ্ট্রেলিয়ার মানুষ একত্র কোরলে আমাদের এই "বঙ্গের বাহিরের বাঙ্গালীদের" সংখ্যার কাছাকাছি আসে; প্রবাসী বাঙ্গালী সম্মেলনের সামনে কি বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র পড়ে রয়েছে তার অল্প একটু ইঙ্গিত কোরছি মাত্র। ১৯২৮ সালে আমার সঙ্গে এ-বিষয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের আলাপ হয়। বৃহত্তর বঙ্গের তিনি একজন মহাপ্রাণ সেবক ও হিতকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তাঁর কাজ যদি আমরা চালিয়ে যেতে পারি তবেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। শুধু বাঙ্গলা দেশে নয়, ভারতের যে কোন অংশে বাঙ্গালী যদি তার ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিপন্ন দেখে, তাদের সাহায্য করবার জন্য আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বাঙ্গালী বিদ্বেষ নানাস্থানে গুরুতর আকার ধারণ কোরছে একথা আমরা সকলেই জানি, ৭০ লক্ষ প্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে ৬০ লক্ষের উপর বাস করেন তিনটি প্রদেশে:

আসাম	৩,৯৬০,৭১২
বিহার-উড়িষ্যা	১,৮৫১,৭৯৭
ব্রহ্মদেশ	৩৭৬,৯৯৪
	৬,১৮৯,৫০৩

এই সব প্রবাসী বাঙ্গালীদের সঙ্গে সত্যিকার যোগ রাখতে হ'লে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান দরকার। এই প্রতিষ্ঠান যদি গ'ড়ে ওঠে তাহ'লে সেটি প্রবাসী বঙ্গ সম্মেলনের অক্ষয়কীর্ত্তি ব'লে গণ্য হবে। শুধু ভৌগোলিক সীমা ও জনসংখ্যাই আজ আমাদের সমস্যা নয়, বাঙ্গালীর ভাতকাপড়ের সমস্যাও কম আশঙ্কাজনক মনে হয় না। বাঙ্গালীরা

বঙ্গের বাহিরে অর্থোপার্জ্জন ও জীবিকানির্ব্বাহ কোরছে দেখলে অবাঙ্গালীরা তাদের চক্ষুশূল ভাবেন অথচ বাঙ্গলা দেশের সদর দরজা অন্য সব প্রদেশের মানুষের কাছে বরাবর খোলাই আছে। এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য (statistics) সংগ্রহ ক'রে ছাপা উচিত। "নিজ বাসভূমে" সত্যই আজ বাঙ্গালী "পরবাসী," এটা আমাদের বুঝতে হবে এবং এর প্রতিকার কি তাও ভাবতে হবে। শুধু সেনসাস রিপোর্টই নয়, Linguistic Survey of India (1903) থেকে আমরা দেখ্‌তে পাই, বাঙ্গলা স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকলেই স্বীকার করেছেন যে, সিংভূম মানভূম পূর্ণিয়া ও সাঁওতাল পরগণা বাঙ্গলা ভাষারই এলাকা। স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ব'লেই কি পরবর্ত্তী যুগে দেখছি বাঙ্গালীর শাস্তির ইতিহাস? শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙ্গালী ঘর বেঁধেছে, কাজ ক'রে এসেছে বিহারে, আসামে, উড়িষ্যায় অথচ এখন সেখানে তাদের অবস্থা কি? ভাষা ও শিক্ষাগত সমস্যা যতই কঠিন হোক, কঠিনতর সমস্যার উদ্ভব হয়েছে ছোটনাগপুরকে বাঙ্গলা থেকে ছিনিয়ে নেবার ফলে। এখানকার আদিবাসী-দের সঙ্গে বাঙ্গালীদের বহু যুগের সম্বন্ধ। আদিবাসীরা তাদের মাতৃভাষা ছাড়া প্রধানতঃ বাঙ্গলা ভাষাই ব্যবহার কোরতে শিখেছিল অথচ ছোটনাগপুরে আজ বাঙ্গালীর স্থান অতি সঙ্কীর্ণ।

ছোটনাগপুরের খনিজ সম্পদের কথা সকলেই আমরা জানি। সারা ভারতের লোহা প্রায় এক সিংহভূমের খনি থেকেই আসে। তাছাড়া তামা, সীসা, নিকেল, অভ্র প্রভৃতির উৎপত্তির স্থানও ছোটনাগপুর। বাঙ্গালী প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের গবেষণা থেকেই জামসেদপুরের এই বিরাট লোহা ও ইস্পাতের কারখানা গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু বাঙ্গালী তা থেকে কতটুকু লাভবান হয়েছে? দেশগৌরব আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের গবেষণা বাঙ্গালী কেন তার ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে লাগাতে পারে না? কোথায় তার শিক্ষার ত্রুটি? এবং সেই ত্রুটি দূর কোরতে না পারলে আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যে কিরকম বিপ্লব ঘনিয়ে আসবে—এই সব প্রশ্ন প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনকে নাড়া দিচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন প্রতিকূলতার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বাঙ্গালী হয়ত সাময়িকভাবে শ্রান্ত, কিন্তু সে সজাগ হয়ে উঠেছে; ক্ষণিক আরামের মধ্যে আমরা হয়ত পরস্পরকে ভুলে ছিলাম, কিন্তু আজ অভাব, অপমান ও আঘাতের মধ্যে আমরা যেন এক হ'তে পারি। রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, ও রবীন্দ্রনাথ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ, অযোগ্য হলেও আমরা তাঁদেরই বংশধর—এটি নতুন কোরে অনুভব কোরতে হবে এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের শেখাতে হবে তারা দীন নয়, তাদের ভবিষ্যৎ আছে।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে "বৃহত্তর বঙ্গ" শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

মতান্তর ও মনান্তর

বুদ্ধদেব বসু

"Where gentlefolk meet, compliments are exchanged."
"Servants talk about persons, their masters talk about things."

আমি তার্কিক নই। আলাপ-আলোচনা আমি পছন্দ করি, গল্প-গুজব ভালোবাসি, অল্প-স্বল্প পরচর্চাও মন্দ লাগে না। যাকে আড্ডা বলে তাতে মশগুল হওয়ার আমার বিশেষ একটু প্রতিভাই আছে, কিন্তু আড্ডা যখন বিতর্ক-সভায় পরিণত হবার উপক্রম হয়, তখন আমার মন-খারাপ হ'য়ে যায়, মুখ দিয়ে কথা সরে না। কোন জবরদস্ত তর্কবাগীশের পাল্লায় পড়লে আমার বুদ্ধি উদ্দীপিত হয় না, স্নায়ু উৎপীড়িত হয়, প্রত্যুত্তরের ঝাঁঝালো রসে জিভ শানিয়ে নেয়া দূরে থাক্, জিহ্বার স্বাভাবিক চলৎশক্তিটুকুও যেন অসাড় হ'য়ে যায়। তর্কের কেলাশে আমার স্থান একেবারে লাস্ট্ বেঞ্চিতে।

এর কারণ এ নয় যে আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। যেমন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় করেন। শুনেছি দিলীপকুমার তর্ক ভালোবাসেন না, যারা তর্ক করে তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলেন, কারণ তিনি যা বিশ্বাস করেন তার বিরুদ্ধে কোনরকম মন্তব্য শুনতেও তিনি নারাজ, বাদানুবাদের ব্যর্থতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ।

বিশ্বাস সত্যি যদি দৃঢ় হয় তাহ'লেই তো নির্ভয়ে বিরোধিতার মুখোমুখি দাঁড়ানো যায়, সুতরাং বিরোধিতা সম্বন্ধে যিনি অসহিষ্ণু তাঁর বিশ্বাসই আসলে দুর্বল, এ-যুক্তি খুব সহজেই মনে আসে। যুক্তিটি চমক-লাগানো, কিন্তু মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ভুল। যাকে অত্যন্ত ভালোবাসি তার নিন্দা যে করে তার মুখ দেখতে ইচ্ছা না-করাটা নিন্দনীয় নয়। মনে-প্রাণে আমি যা বিশ্বাস করি তার যে বিরোধী তার সম্বন্ধে সহনশীলতা শুধু অমানুষিক নয়, দুর্মানুষিকও হ'তে পারে। সহনশীলতা সর্বত্রই গুণ নয়, উন্মত্ততা অর্থাৎ ফ্যানাটিসিজ্‌ম্ সর্বত্রই দূষ্য নয়। খানিকটা ফ্যানাটিক না-হ'লে কোনো কাজই এগোয় না, পথের মোড়ে-মোড়ে নানারকমের আপোষ করতে-করতেই দম ফুরিয়ে যায়। ধর্ম যখন জীবন্ত ছিলো, তখন ধর্মের গোঁড়ামি তাকে সংকীর্ণ যেটুকু করেছে, শক্তিমান করেছে তার ঢের বেশি। ধর্ম যখন থেকে মৃত, তখন থেকেই

তার সংকীর্ণতা ভয়াবহ রূপ নিলো, কারণ তা হ'য়ে পড়লো শক্তিহীনের দাঁতে দাঁত ঘষা। এ-কথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে বিশ্বাসেই মানুষ বাঁচে, কিন্তু এও সত্য যে জ্যান্ত বিশ্বাসে যতখানি বাঁচে, মৃত বিশ্বাসে ঠিক ততখানিই মরে। কিন্তু কোনটা জ্যান্ত আর কোনটা মৃত, এই তো আবার এক তর্কের সূচনা !

তর্কবিমুখতার আর-একটা কারণ থাকতে পারে, সেটা নেহাৎ ব্যক্তিগত। সেটা আর-কিছুই নয়, আত্মম্ভরিতা। অনেকে আছেন, কেউ কোনো কথার প্রতিবাদ করলেই চ'টে যান। অন্য সকলে ছোটো বড়ো সমস্ত বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত হবেই, এটা তাঁরা অত্যধিক আত্ম-প্রীতির বশে ধ'রে নেন, এ-ধারণা সামান্য আঘাত পেলেও অসহ্য লাগে। কৃতী ব্যবসায়ী, পণ্ডিত প্রোফেসর, অত্যন্ত আত্ম-সচেতন শিল্পী—এঁদের মধ্যে মাঝে-মাঝে এ-রকম লোক দেখা যায়।

আমিও কি ঐ দলের ? আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, তা আমি নই। কোনো দু'জন মানুষ সমস্ত বিষয়ে একমত হ'তে পারে না, এ-কথা তো স্বতঃসিদ্ধ। কিছু-কিছু গরমিল থাকে ব'লেই তো মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলামেশায় আনন্দ। আমার সঙ্গী যদি হুবহু আমার মতোই হয়, তার চেয়ে ক্লান্তিকর আর কী হ'তে পারে ? যে-মানুষ সব কথাতেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে যায়, তার সঙ্গে কতক্ষণ আলাপ চলে ? যেখানে প্রত্যেকটি মন স্বতন্ত্র, খানিক-পরে-পরেই নতুন দিক থেকে নতুন আলো পড়ছে, সেখানেই তো কথাবার্তার সুখ। তবে তর্কে আমার ভয় কেন ?

তর্কে আমার ভয়, কারণ সত্যি যা তর্ক তা প্রায়ই কুতর্ক। আর কুতর্কের ব্যর্থতা অব্যর্থ। সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দু'দল বা দু'জন কথা বলছে—একে অন্যকে নিজের দিকে টানবার আশায়—এই টগ্-অব-ওঅর নিতান্তই স্নায়ুবিদারক। আর কিছুই হয় না, তর্কের শেষে (এ-সব তর্কের কোনো শেষও নেই, কথায় কথা বাড়ে, গলা চড়ে, মেজাজ গরম হয়, তারপর নেহাৎই এক জায়গায় থামতে হবে ব'লে থামে) —হ্যাঁ, তর্কের শেষে বিশ্রী একটা অবসাদ মনকে ঘেরে, মুখে যেন ধুলোবালির স্বাদ লেগে থাকে। কথাবার্তা বলার যে একটি উজ্জীবনী প্রভাব, যাতে মন সরস হয়, মগজে নানারকম নতুন ভাব খেলা করে, শরীরে ফুর্তি আসে, তা এতে পাওয়া যায় না। তা যাতে পাওয়া যায়, তাকে আমি বলবো আলোচনা, তাতেই আমি সুখ পাই। সমস্ত অনৈক্যের অন্তরালে সকলের মধ্যেই যখন গভীর মূলে মিল থাকে, তখনই আলোচনা সম্ভব। একটা প্রস্তাবকে বিভিন্ন লোক যখন বিভিন্ন দিক থেকে দেখছে, তখনই কথাবার্তার সুখ, কিন্তু সেই প্রস্তাব যে আলোচনার যোগ্য এ-বিষয়ে অন্তত সকলের মিল থাকা চাই। অর্থাৎ মূল্যবোধ সকলেরই মোটামুটি এক হওয়া দরকার। এ যখন

হয়, তখন প্রসঙ্গটা এক মুখ থেকে আর-এক মুখে ধাক্কা খেতে-খেতে সামনের দিকে এগোয়, মনে হয় কোথাও পৌছনো যাবে, কখনো-কখনো পৌছনো যায়ও। এতে মনের রীতিমতো লাভ হয়, সার্থক হয় বাক্যব্যয় ও কালক্ষেপ। এইজন্যেই মানুষ সর্বদাই স্বজাতি খোঁজে, সকলের সঙ্গে সকলের বন্ধুতা হয় না, কিংবা ভিন্নমার্গী পরিণতি অনুসারে বন্ধুতায় ভাঙন ধরে। দু'জন মানুষ পরস্পরের গুণাবলী সম্বন্ধে সচেতন হ'য়েও যে সব সময় বন্ধুতায় আবদ্ধ হয় না তারও বোধ হয় এই কারণ। মূলগত ঐক্য যেখানে নেই, যেখানে মূল্যবোধই স্বতন্ত্র, শুধু সেখানেই তর্কের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ কথাবার্তার কোনো অগ্রগামী গতি থাকে না, সমস্ত কথা ঘুরে-ঘুরে একই জায়গায় ফিরে এসে এক বিষাক্ত বৃত্তের সৃষ্টি করে। এই তর্ক আমার আতঙ্ক। এর মতো ক্লান্তিকর আর নিষ্ফল আর-কিছু নেই।

এ-কথা খুব স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলুম কিছুদিন আগে যখন এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীকে নিয়ে আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন। স্বামীটি স্বভাবরসিক সহৃদয় চমৎকার মানুষ, স্ত্রীও বুদ্ধিমতী হাসিখুসি বাক্‌নিপুণা। এঁদের সঙ্গে দেখাশোনা কম হয়, কিন্তু দেখা হ'লেই ভালো লাগে, এঁদের বাড়িতে একটা সন্ধ্যা অনুপম আনন্দে কেটেছিলো সে-কথা প্রায়ই মনে পড়ে। এঁদের আবির্ভাবে তাই মন অত্যন্ত খুসি হ'য়ে উঠেছিলো ; কিন্তু এমনি দুর্দৈব যে সেদিন দু'এক কথার পরেই হঠাৎ এমন এক প্রসঙ্গ উঠলো যে-বিষয়ে তাঁদের ও আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষ-কোনো ব্যক্তিকে তাঁরা মনে করেন অতিমানুষ, আমরা মনে করি বুজরুকি, বিশেষ-কোনো আদর্শ তাঁরা যত প্রবলভাবে মহান ব'লে মানেন আমরা ততই তীব্রভাবে সমাজের ক্ষতিকর ব'লে বিশ্বাস করি। এ-প্রসঙ্গ যদি দৈবক্রমে না উঠতো তাহ'লে সন্ধ্যাটি চমৎকার হাস্যালাপে আনন্দে কাটতো, কিন্তু দু'এক মিনিটের মধ্যেই বিশ্রী একটা তর্কের সৃষ্টি হ'লো, তাঁরা যতক্ষণ রইলেন অন্য-কোনো কথা হ'লো না, যদিও প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিলো যে কোনো পক্ষই বিপক্ষের কথা শুনে মত বদ্‌লাবে না। তাঁরা যখন গেলেন, নিজের উপরেই গভীর বিরক্তি বোধ করলুম ; কারণ প্রথম দু'চার কথার পরেই হাবভাব বুঝে নিয়ে প্রসঙ্গ বদ্‌লে দেওয়াই হ'তো বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু এতখানি আত্ম-সংযম খুব কম লোকেরই আছে। জানি, এতে কোনো লাভ নেই ; জানি, কথায়-কথায় অসংখ্য বাজে কথা জন্ম নেবে—তবু নিজের মতটা যথাসম্ভব সাজিয়ে-গুছিয়ে জাহির করবার লোভ সামলাতে পারিনে, এ-দুর্বলতা থেকে প্রায় কেউই মুক্ত নয়।

অন্যপক্ষে, আমার এক দার্শনিক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় আমি

অতি গভীর আনন্দ পাই। তাঁর কথাবার্তা কখনো-কখনো তর্কের রূপ নিলেও আসলে তা তর্ক নয়, অন্তত আমার মতে নয়। প্রথমে তিনি একটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন, সকলের মুখে-মুখে তা যতক্ষণ আলোড়িত হ'য়ে ফেরে তিনি বাঁকা চোখে প্রত্যেক বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে মন দিয়ে শোনেন, তারপর এমন-কিছু বলেন যা নিখুঁত ন্যায়সম্মত, যার উপর, তখনকার মতো, আর-কিছু বলবার থাকে না। একটু অপেক্ষা ক'রে তিনি অন্য-কোনো কথা পাড়েন এবং সেটিও ঐভাবেই শেষ হয়। তাঁর আলাপে শুধু যে শালীনতা ও চিন্তাশীলতাই আমার মন টানে তা নয়, তার নির্বাহুল্যও আমাকে মুগ্ধ করে, যখন দেখি এক কথা তিনি দু'বার বলেন না, এবং আপাতত কোনো মীমাংসা হ'লেই সে-প্রসঙ্গ ত্যাগ করেন। এ-পদ্ধতি আমার পছন্দ এইজন্যে যে এতে কথোপকথন বিচিত্র ও গতিশীল হয়, উপস্থিত সকলকেই কিছু-না-কিছু বলবার সুযোগ দেয়া হয়, হাতে যেটুকু সময় আছে তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার শুধু এতেই সম্ভব। কথোপকথনের আনন্দ বলতে আমি এই বুঝি।

তাহ'লে এখন এই প্রশ্ন বাকি থাকে যে যাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমার সম্পূর্ণ বিপরীত তাদের সম্বন্ধে কোন্ মনোভাব যুক্তিসঙ্গত? তাদের সঙ্গ এড়িয়ে চলাটা এক হিসেবে বুদ্ধিমানের কাজ, কিন্তু এ-ব্যবস্থায় খানিকটা স্বার্থপরতা—কিংবা অত্যাধুনিক চলতি বুলিমতো 'পলাতক মনোবৃত্তি'—ধরা পড়ে। এ ছাড়া অবশ্য আর একটিমাত্র উপায় আছে: বিপরীত দলের সম্মুখীন হ'য়ে যুক্তির সাহায্যে তাদের মনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা, অর্থাৎ, নিজের বিশ্বাসের পক্ষে প্রাণান্ত প্রোপাগাণ্ডা করা। এ-ব্যবস্থার অসুবিধে এই যে এতে বিপরীত দলও আত্ম-প্রতিষ্ঠায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠবে; প্রশ্নে, উত্তরে ও প্রত্যুত্তরে, জটিল ও অন্তহীন বিতর্কে দু'পক্ষের প্রোপাগাণ্ডাই চরমে এসে ঠেকবে, অথচ যতটা সময় ও শ্রমক্ষয় হয় সে-অনুপাতে কোনো পক্ষেরই লাভ হবে না। কারণ এ-কথা মনে করা অত্যন্ত ভুল যে মানুষ যেহেতু বুদ্ধিমান জীব, যুক্তির শ্রেষ্ঠতাতেই তাকে বশ করা যায়। বরং এ-কথাই সত্য যে যেহেতু আমরা বুদ্ধিমান জীব আমরা সর্বদাই আমাদের মনের ইচ্ছাকে ন্যায়ের আচ্ছাদনে ঢেকে প্রকাশ করতে চাই, আমাদের যুক্তিগুলো তাছাড়া কিছু নয়। আমার ইচ্ছা আমার পক্ষে যতটা মূল্যবান, আপনার ইচ্ছাও আপনার পক্ষে তা-ই, সব যুক্তির মূল্যই তাই সমান। আমার জীবন যদি এমন হয় যে অনুপার্জিত আয়ের মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে দিন কাটাই তা'হলে যে-সমাজব্যবস্থায় আমার অস্তিত্ব সম্ভব তার প্রতি আমার বিশ্বাস হবে অচল এবং তার সমর্থনে নানা চতুর যুক্তি আমার মগজ সহজেই উদ্ভাবন করতে পারবে। প্রতিপক্ষ কেউ যদি থাকেন যিনি বিশ্বাস করেন যে খাটে না সে খাবেও না, তাঁর সমস্ত

ভালো-ভালো যুক্তি আমার কানে অতি অসার, অত্যন্ত হাস্যকর ঠেকবে; আর যদি বা তাঁর কথা আমার মনে কিছুমাত্র দাগ কাটে, তার ফলে আমি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির দিকে হেলবো না, বরং সতর্ক হ'বো, তাঁর এবং তাঁর মতো অন্য সকলের মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করবো। এখানেও তর্কের নিষ্ফলতাই প্রমাণ হয়; যিনি যেরকম বিশ্বাস করলে নিজের স্বার্থ (স্বার্থ কথাটা এখানে অনেকটা বড়ো অর্থেই ব্যবহার করছি) রক্ষা হয় তিনি তা-ই করবেন, এবং প্রতিপক্ষের কোলাহল যতই তাঁর কানে আসবে ততই তিনি আরো জোরে সেই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরবেন। কোন্ বিশ্বাস সত্য আর কোনটা ভ্রান্ত তা নির্ধারণ করবার মতো কোনো নিরপেক্ষ নীতিও নেই, সত্য, মুক্তি ও ন্যায়-বিচারের আদর্শও স্থির নয়, বিভিন্ন দলের মুখে এদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা। আমি আর আপনি শত্রুতায় প্রতিশ্রুত, অথচ আমরা দু'জনেই মুক্তির ঢাক পেটাচ্ছি, এই যখন অবস্থা তখন সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য কোন্ দিকে তাকানো যায়? তখন ইতিহাসের শরণ নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না, কারণ মনুষ্যসমাজে ইতিহাসই একমাত্র শক্তি যা নিরপেক্ষ। যে-দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের স্বপক্ষে তাকেই সত্য বলা যেতে পারে। আর, কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি ইতিহাসের স্বপক্ষে তাও তর্কসাপেক্ষ নয়, কালক্রমে ঘটনাচক্রই তা প্রমাণ করে। যাঁরা জানেন ইতিহাস তাঁদের পক্ষে তাঁরা এও জানেন যে যুক্তির সাহায্যে বিরোধিতা উপশমের চেষ্টা বৃথা, সময় যখন আসবে তখন আঘাত করতেই হবে। বিপ্লবী নেতারা তাই তর্ক করেন না, উচ্ছেদ করেন।

দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত অনৈক্য যেখানে, সেখানে বিরোধিতাই শুধু সম্ভব, এবং বোধ হয় বিরোধিতাই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তিগত জীবনে এ-বিরোধিতা উগ্র হ'য়ে ওঠবার দরকার করে না, পরস্পরকে এড়িয়ে চললেই ভদ্রতা রক্ষা হয়। কিন্তু এ-বিরোধ যখন সমগ্র সমাজ-জীবনে সংক্রামিত হয়, তখন নানাদিক থেকে তা চাপা দেবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও একদিন তা দারুণ বিস্ফোরণে জ্ব'লে ওঠে—তখনই যুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব ও প্রতি-প্রতিবিপ্লবের আবর্তে মন্থিত হ'তে হ'তে নতুন সমাজ জন্ম নেয়, হয়তো মানুষের সুখ স্বাস্থ্য শান্তি ফিরে আসে। আপনার আমার মতদ্বৈধে কিছুই এসে যায় না, এ-কথাই সহজে মনে হয়, কিন্তু আসলে হয়তো ঠিক তা নয়। এমনি সব ছোটো-ছোটো মতদ্বৈধ জমা হ'তে-হ'তে একদিন বিরাট আকার ধারণ করে, তার চাপে সমগ্র সমাজ ভেঙে যায়। অবশ্য যদি সে-সব মতের পিছনে জীবন্ত বিশ্বাস থাকে, যদি তা সৌখিন বুলি মাত্র না হয়।

এখানে একটি কথা মনে পড়লো, এটিও শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের। তিনি তাঁর একটি নতুন বইয়ে আক্ষেপ ক'রে বলেছেন যে মতান্তর সর্বদাই মনান্তরে পরিণত

হয়—আমাদের দেশে। মতান্তর সম্বন্ধে নিজে অত্যন্ত স্পর্শকাতর হ'লে অন্যের উপরেও তা আরোপ করবার ঝোঁক হয়; কিন্তু সে যা-ই হোক্‌, দিলীপকুমারের এ-কথায় আমি আক্ষেপ করবার মতো কিছু দেখতে পাইনে, কিংবা এ এমনও কিছু নয় যা আমাদের দেশেই শুধু দেখা যায়। মতান্তর থেকে মনান্তর হবেই—সব দেশেই হয়—আমাদের দেশেও যে হয় তা শুনে খুসি হলাম, কারণ এতে বোঝা গেলো যে আমাদের মৃতদেহে কিছুটা অন্তত জীবনসঞ্চার হয়েছে। আমাদের দেশ সম্বন্ধে আমার আপত্তি এই যে আমাদের মতামতগুলো অত্যন্ত হালকা, অর্থাৎ মুখে যা বলি তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কাজ করতে হ'লে প্রায়ই আমরা পেছিয়ে পড়ি। নিজেদের মূল্য আমরা অতি সহজেই বিকিয়ে দিই, অন্যের মূল্য সম্বন্ধেও তাই আমরা অচেতন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করুন আমি লেখক। আমি যা লিখি তা অনেকেরই পছন্দ হয় না, হয়তো কারো-কারো পছন্দ হয়। এখন, পছন্দ যাদের হয় না তারা আমার জীবন দুর্বিষহ ক'রে তুলতে যতখানি ও যতরকমের ষড়যন্ত্র করতে পারে, কার্যত তার অতি সামান্য অংশই করে; আবার আমার লেখার যারা অনুরক্ত ব'লে পরিচয় দেয় তাদের কাছ থেকে ফলপ্রসূ সমর্থন প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। উভয় পক্ষই মোটের উপর নিষ্ক্রিয়, মোটের উপর উদাসীন। যে-সব দেশের লোক আমাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত জ্যান্ত তাদের বিদ্বেষ যত নিষ্ঠুর, অনুরাগও ততই গভীর ও সক্রিয়। আমাদের দেশে শত্রুতাও প্রবল নয়, বন্ধুতাও দুর্বল; মতামতগুলো আমাদের পোষাকি কাপড়, সভায় প'রে যাই, বাড়ি এসে বাক্সে তুলে রাখি। এ-অবস্থায় আমাদের দেশেও যদি আজকাল মতান্তর থেকে মনান্তর ঘটবার উদাহরণ পাওয়া যায়, সে তো আশার কথাই।

মতান্তর অবশ্য নানারকমের আছে। শুঁটকি মাছের গন্ধ আমার অসহ্য, কিন্তু আমার কোনো-কোনো বন্ধুর অতি প্রিয় খাদ্য শুঁটকি। আমার এক বন্ধু, যিনি একজন প্রসিদ্ধ কবিও, এবং যাঁর সাহিত্যবিচারের উপর আমার গভীর শ্রদ্ধা, তিনি তাসখেলায় অত্যন্ত আসক্ত, অথচ কয়েকজন লোক ব'সে তাস খেলছে, এ-দৃশ্য দেখলেও আমি অসুস্থ বোধ করি। বলাই বাহুল্য, এ-সব কারণে বন্ধুতায় কখনো চিড় ধরে না। এমন কি, বাংলা ফিল্ম দেখতে ভালোবাসেন এমন লোকের সঙ্গেও আমার সদ্ভাব অসম্ভব মনে হয় না, যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে মেলবার মতো প্রশস্ত জায়গা থাকে। খাওয়া-পরা, আমোদ-প্রমোদের রুচিবৈষম্যে মারাত্মক কিছু এসে যায় না, এ আমরা সকলেই জানি। কিন্তু এ ছাড়াও জীবনে নানা জিনিস আছে যেখানে বৈষম্য প্রায় বিরোধে পরিণত হয়। ধরুন, এমন কেউ যদি থাকেন যিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথ বাজে কবি এটা নিশ্চিত যে

তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুতা কখনো হবে না। কারণ রবীন্দ্রনাথকে যিনি অবজ্ঞা করেন, তিনি আমার অস্তিত্বসুদ্ধু অস্বীকার করেন, যে-হেতু রবীন্দ্রনাথের ভিত্তির উপরেই আমি দাঁড়িয়ে আছি। এ-ধরণের প্রভেদ এমনই যে উভয়পক্ষের যথেষ্ট সদিচ্ছা সত্বেও পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। মূলগত দৃষ্টিভঙ্গির অনৈক্য থাকলে ব্যক্তিগত বিচ্ছেদও অনিবার্য বললেই চলে। দু'জন মানুষ যদি এমন হয় যেখানে একজনের সাধনা অন্যের উপহাসের লক্ষ্য, একের অবিশ্বাস অন্যের জীবনসম্বল, সেখানে যে কী ক'রে মিলন সম্ভব আমি তো ভেবে পাইনে—যদি না মা-ছেলে কি স্বামী-স্ত্রী এইরকম কোনো গভীর স্বার্থজড়িত সম্বন্ধ থাকে। এমন কি, মা-ছেলে কি স্বামী-স্ত্রীর মতো অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এ-রকম অমিল গভীর ব্যবধানের সৃষ্টি করে, তাতে সন্দেহ নেই। পঞ্চাশ বছর আগেকার মদ্যপ, মাংসাশী বিলেত-ফেরৎ ব্যারিষ্টর স্বামী আর বামুন-পুজো-করা, ছোঁয়াছুঁয়ি-নিয়ে-চিরশঙ্কিত পরম হিন্দু স্ত্রীর ঘরকন্নার ছবিটা একবার মনে-মনে ভাবলেই একথা বোঝা যাবে। এ-ক্ষেত্রে ভাগ্য নেহাৎ ভালো হ'লে স্ত্রী স্বামীকে ও স্বামী স্ত্রীকে জীবন ভ'রে সহ্য ক'রে গেছেন মাত্র, দু'জনের মধ্যে কোনো প্রকৃত মানুষী সম্পর্ক কখনো স্থাপিত হয়নি। কিন্তু নিজের স্ত্রীতে কি স্বামীতে লোকে যা ভালোমানুষি থেকে কি পারিবারিক অশান্তির ভয়ে সহ্য করে, বহির্জীবনের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে তা চোখে দেখলেই জ্ব'লে উঠবে। ধরুন, আপনি যদি বিশ্বাস করেন যে ধর্মের অন্ধ মোহই আজ ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড়ো ক্ষতি করছে, আর অন্য কেউ যদি প্রচার ক'রে বেড়ান যে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে পারলেই আমাদের সব দুঃখের অবসান হবে, তা'হলে সেই ব্যক্তিটিকে অন্যান্য কারণে আপনি যতই প্রশংসার চোখে দেখুন না, তাঁর সঙ্গে মনান্তর আপনার ঘটবেই। আপোষ অনেকদূর পর্যন্ত চলে, কিন্তু বরাবর চলে না; যখন এমন মতের দেখা পাওয়া যায়, যা কাজে খাটালে আপনার অস্তিত্বই বিপন্ন, যা-কিছু নিয়ে আপনার সত্তা তা একেবারে অস্বীকার না-ক'রে যা টিঁকতে পারে না, তখন মতান্তর থেকে মনান্তরে উপনীত হ'তেই হয়। তা ছাড়া উপায় নেই।

বিধাতার বিধানে

কপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

ঘোড়াটা অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলার। কোন লক্ষপতি রেসের জন্য আনিয়েছিলেন। নিয়তি তাকে বেঁধেছে দিল্লীর রাজপথে এক টাঙার জোয়ালে। কে জানে কি খুঁৎ হ'য়েছিল, হয়তো রেসকোর্সে তার জীবনের প্রথম রেসেই ইঁদুরের গর্ত্তে পা পড়েছিল, কিংবা জকিটাকে কেউ ঘুস-ই খাইয়েছিল,—মোটের মাথায় টারফে তার স্থান হয়নি। পরিবর্ত্তে সে দিল্লী জংসন থেকে দরিয়াগঞ্জ সড়ক্ ধ'রে নিউ দিল্লী পর্য্যন্ত ছোটে। পিছনে ওই দু'চাকার টাঙা, মানুষগুলো বসেছে ঘোড়ার দিকে পিছন ফিরে—শুধু টাঙাওয়ালা চাবুক হাতে তার দিকে ফিরে আছে।

হতভাগা ঘোড়া। টাঙাওয়ালা নিলামের ডাকে তাকে কিনে এনেছে—তার সায়ার কিংবা ডেমের খবর সে রাখে না, অষ্ট্রেলিয়ান ওয়েলারই হো'ক আর আরবের টাট্টুই হো'ক টাঙাওয়ালা চায় কদমচালে তার টাঙাখানা টানাতে। বেশী তেজের দরকার নেই, একটু নির্ব্বীর্য্য হওয়াই ভাল……কম খেতে দিয়ে তাকে ক্রমশঃ ধাতে এনেছে। পাঁজরার হাড় তার বেরিয়েছে। ঠুলিবাঁধা চোখে সে আশেপাশে দিল্লীর কেল্লা, কুতবমিনার, হুমায়ুনের-পতন-প্রসিদ্ধ-সিঁড়ি কিছুই দেখতে পায় না, যখন যাত্রীদের সেখানে পৌঁছাতে নিয়ে যায়।

এই হতভাগ্য ঘোটকেরই গ্রেট-গ্রাণ্ডসায়ার, প্রপিতামহের পিঠে দাঁড়িয়ে অষ্ট্রেলিয়ার কোন আদিম অধিবাসী তেজস্বী জোয়ান সবলে তার বুমেরাং ছুঁড়তো। দিশেহারা তেপান্তরের মাঠে তার উদ্দাম বিদ্যুৎগতি, সে গতির ফলে, বাতাস তার সারা অঙ্গ বেয়ে প্রচণ্ড ঝড়ের ঝাপট্ তুলত……

সেই জাতের ঘোড়া, চোখ দিয়ে এর দুর্দ্দশা দেখা যায় না। কিন্তু উপায় কি? —নিয়তি।

টগ্ বগ্ টগ্ বগ্ কদমচালে ঘোড়া ছুটিয়ে টাঙাওয়ালা আমায় দিল্লীর দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখিয়ে নিয়ে বেড়াল; এক নাগাড়ে আধবেলার ভেতর ঘোড়াটা প্রায় দশক্রোশ রাস্তা ছুটেছে, পাথরে বাঁধানো রাস্তা। কুতবমিনার থেকে ফিরে চাঁদনিচকে এসে সে চার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে দুলে দুলে হাঁপাতে লাগলো—এখুনি বুঝি পড়ে'

যায়। কন্‌কনে শীতের হাওয়ায় আমার হাড়ের ভেতর অবধি ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপছিল। শীতের জন্যে ঘোড়ার গা বেয়ে ঘাম ঝরছিল না, কিন্তু তবু তার কী ক্লান্তি! তাকে আর খাটাতে মন আমার চাইছিল না।

টাঙাওয়ালাকে বল্লাম: তোমার টাঙায় আর আমি চ'ড়ে থাকবো না, আরও এক ঘণ্টা অবশ্য ভাড়া হিসেবে বাকি আছে—কিন্তু তোমার ঘোড়া বড় হাঁপিয়ে গিয়েছে।

টাঙাওয়ালা বল্লে: নেহি সাআব! ঘোড়া হাঁপাতেই পারে না, এ ভাল জাতের ঘোড়া—হাঁপালেই হ'লো! কোথায় যাবেন বলুন, আপনাকে আমি পৌঁছে দেবই—

বল্লাম: ভারি শীত পড়ছে, একটা ওভার-কোট তৈরী করাতে হবে। খুব সস্তায় করাতে চাই;—আমাদের ক'লকাতায় শীতে তো আর ওভার-কোট লাগে না, ওটা পড়ে' থাকবে—। তুমি কোন দোকান জান, যেখানে সস্তায় একটা ওভার-কোট ক'রে দেবে?—কিন্তু তোমার টাঙায় আমি চড়ছি নে, তোমার ঘোড়া মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে' যাবে, প্রাণী হত্যার ভাগী আমি হ'তে পারবো না। তাকে ভাড়া চুকিয়ে দিতেই সে আহ্লাদে বিগলিত হ'য়ে আমায় লম্বা সেলাম ক'রে বল্লে: ঠাহ্‌রিয়ে সাআব। আমি আপনাকে খুব ভাল দর্জ্জির দোকানে নিয়ে যাচ্ছি, খুব সস্তাও। আমার টাঙাটাকে ওই গাড়ীর আড্ডায় রেখে আসি। ঘোড়ার মুখে সাত্তুগোলার বাল্‌তিটা ঝুলিয়ে দিয়েই ফিরে আসছি।

টাঙাওয়ালা পথ দেখিয়ে আমায় যেখানে নিয়ে চল্লো, সেখানটা ক'লকাতার চীনে পাড়ার গলির মতই সংকীর্ণ—কিন্তু অন্ধকারে আর জনাকীর্ণতায় দিল্লীর চাঁদনিচকের এই গলি বোধকরি চীনাপাড়াকেও হার মানায়। শীতের দ্বিপ্রহর হ'তে চল্লো, এখনও সূর্য্যালোক প্রবেশ করতে পারেনি, সারা দিনের ভেতর পারবে এ-ভরসাও হয় না। গলির পথের ওপরে জল পড়ে' যে সামান্য কাদার সৃষ্টি হ'য়েছে, ঠাণ্ডায় তা তুষারের মতই শীতল।

গলির দু'পাশে সারি-দেওয়া ছোট ছোট কুঠুরি, তাতে নানা রকমের কারখানা। কোনটাই আয়তনে পাঁচ হাতের বেশী নয়। তারই মধ্যে কোনটায় ছোপানো কাপড় ছাপা হ'চ্ছে নানা নক্সায়, আবার কোনটিতে চক্রাকারে পনের বিশ জন স্ত্রী পুরুষ ব'সে চর্ম্ম পাদুকা সেলাই করছে। অনেক মেয়ের কোলেই নবজাত শিশু, শিশুর বুকের উপরেই এক এক পাটি জুতা ধরে' জরির কাজের নক্সা তুলছে! এতে তারা দিনান্তে ক'পয়সাই বা উপায় করে? বিনিময়ে যে আহার তারা পায়, তাতে ব্যয়িত শোণিতের কতখানি আবার পাকস্থলির ভিতর দিয়ে ধমনীতে ফিরিয়ে পায়?

পায়ে আমার মোটা পশমের মোজা ছিল, তবুও যেন মোজার মোটা আচ্ছাদন

ভেদ ক'রে আমার জুতা জোড়া আমায় দংশন করছিল। এমনি কোন শ্রমিক-কন্যাই হয়তো এই ডার্ব্বি শু-জোড়াও সেলাই ক'রেছে।

এই অন্ধকার গলির পথ ধরেই অবশেষে এক দর্জ্জির দোকানে পৌছলাম—এরাই সস্তায় আমার ওভার-কোট সেলাই ক'রে দেবে। দেখে শুনে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হ'ল, এখানেই খুব সস্তায় কাজ পাওয়া যাবে। টাঙাওয়ালা সেলাম ক'রে বিদায় নিলে।

দর্জ্জি পাঞ্জাবী। বৃদ্ধ আর তার পুত্র দোকানে কাজ করছিল। পুত্রের বয়স বোধকরি বছর চল্লিশ হবে। সে-ই সেলাই-এর কলটা পা দিয়ে চালিয়ে চলেছে, একটা শেরোয়ানি জামা সেলাই করছে। আর বৃদ্ধ বসেছে মেজের একটি কম্বলে, সুতো-বাঁধা চশমার সাহায্যে একমনে একটি সুতীক্ষ্ণ সূচ হাতে—সেলাই করছে। উত্তর পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য অধিবাসীদের মত প্রকাণ্ড আয়তন। পিতাপুত্র উভয়ের মুখেই জরার ছাপ, কিন্তু ছেলেটিকে দেখলেই বুঝতে পারা যায়, যৌবনে সবল পুরুষই সে ছিল। দারিদ্র্যের কঠোর সংগ্রামও তাদের ততটা কাবু ক'রতে পারেনি, যতটা চেষ্টা করেছিল।

বৃদ্ধ যেখানে ব'সে আছে, তার পিছনেই ঘরখানিতে শাদা কাপড়ের পর্দ্দা টাঙানো, এই পর্দ্দার পিছনেই এদের অন্দরমহল। সেলাই-এর কল ছেড়ে খলিফা সাহেব যখন আমার দেহের মাপ নিচ্ছিল, একটি দশ এগার বছরের ছেলে ওই পর্দ্দা ঠেলে বাইরে এল, মুখে তার উচ্ছিষ্ট খানিকটা ডাল লেগে রয়েছে। দেখেই বুঝতে পারলাম, সে ওই অন্দরমহলে বোধকরি তার মায়ের কাছেই, ডাল-রোটি খাচ্ছিল।

বালক তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে যাচ্ছিল। বৃদ্ধ তাকে ডেকে বল্লে: কোথায় যাচ্ছিস ওরে বচ্চা? কেবলই খেলা?—বালক ছুটে বেরিয়ে গেল। তার ক্রীড়া-সঙ্গীরা ওইদিকে কোথায় তার প্রতীক্ষায় রয়েছে। বৃদ্ধ আমার দিকে চেয়ে সহাস্যে বল্লে: যেমন বাপ ছিল, তার বেটাও হ'য়েছে তেমনি—কেবল খেলা, কেবল খেলা! কাজকর্ম্ম শেখার নাম নেই।

বাচ্চার পিতা মুখখানা একটু আড়াল ক'রে হাসল, তারপরে আমার দিকে ফিরে বল্লে: তা'হ'লে আপনি কাপড় কিনে নিয়ে আসুন! জামা আপনার কখন চাই?

আমি বল্লাম: আজ সন্ধ্যার মধ্যে দিতে পারবে না?

সে ততক্ষণে আবার তার কলে বসেছিল, আমায় বল্লে: হাঁ, তা পারব বৈ কি! আপনি সাআব "লাঞ্চ" ক'রে কাপড় নিয়ে এসে বসুন ওই কুরসিটাতে, আমরা তিন আদমি খেটে আপনার কোট শেষ ক'রে দেব সন্ধ্যার মধ্যেই। তারপর একটু থেমে বল্লে: আপনি কলকাত্তার লোক—আপনার খাতির করবো বৈ কি। স্পষ্টই বোঝা গেল 'তিন আদমি'র তৃতীয় ব্যক্তি পর্দ্দার আড়ালে তার স্ত্রী।

শুনে একটু গর্ব্ব অনুভব করলুম। দিল্লীর লোক তাহ'লে কলকাতার লোকের খাতির করে! সে আবার একটু হেসে বল্লে: কল্‌কাত্তার লোককে আমার বিশেষ ক'রেই খাতির করা উচিত!—

আমি "লাঞ্চ" করবার জন্যে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। সারা সকাল ঘুরেছি, জঠরে ক্ষুধানল জ্বলতে সুরু করেছে। পিতাপুত্রে দাঁড়িয়ে উঠে আমাকে সেলাম ক'রে পথে এগিয়ে দিলে।

বেলা একটার পূর্ব্বেই আমি ফিরে এসে পর্দ্দার কাছটিতে হাতলভাঙা কাঠের কুরসিখানা টেনে নিয়ে বসলাম। চার গজ পট্টু কাপড় কিনে এনেছিলাম। বৃদ্ধ গজর্ গজর্ করছিল, সন্ধ্যার বাতির পূর্ব্বে বাচ্চা খেলা থেকে বাড়ী ফিরবে না। কল্‌কাত্তার লোক আজ ঘরে এসেছে, তার কি ছাই একটু আহ্লাদও হয় না!—

পিতাপুত্র দু'জনে মিলে চটপট কাপড়টাকে কেটে ফেললে, তাদের হাতে যে কাজ ছিল, সেটা পর্দ্দার অন্তরালে তৃতীয় ব্যক্তিটীকে দিয়ে দিলে, আমার কাজটিই দু'জনে মিলে করবে ব'লে।

তাদের কাজ করবার তৎপরতা সত্যিই মনকে মুগ্ধ ক'রে দেয়,—একটা জামা তৈরীতে কি পরিশ্রম কম? ইতিপূর্ব্বে আমি ব'সে ব'সে কখনও দেখিনি। পট্টুটা কাটা হ'ল, একে একে আস্তিন, গলা—হাতে সেলাই ক'রে ওগুলো জোড়া দেওয়া হ'ল। সেটা আমার দেহে চাপিয়ে ট্রাই দেওয়া হ'ল। পুরোনো আর্সিটায় এক-স্তর ময়লা জমেছে, তার মধ্যে কিছুই বুঝতে পারলাম না জামাটা আমাকে মানাচ্ছে কি না। কিন্তু দর্জ্জি দু'জনের ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা জন্মে গিয়েছিল, কাজেই এদিক ওদিক টেনে, দু'চার জায়গায় সেপটিপিন এঁটে যখন তারা কোটটা আমার গা থেকে নামিয়ে নিলে, আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

বৃদ্ধ সহাস্যে বল্লে: আমার ছেলে যে কল্‌কাত্তায় চৌরংগীর বড় খলিফার কাছে কাজ ক'রত— সে অবশ্য আজ বার-তের বছর আগে!—দেখুন না, আপনার জন্যে ইংলিশ-কাট্ কোট বানিয়ে দিচ্ছি। কল্‌কাত্তার লোকের খাতির আমরা জানি।

খুশী হয়ে আবার কুরসিতে বসলাম। প্রতীক্ষা এখানে অনেকক্ষণই করতে হবে। খট্, খট্ খট্ খট্—অতিদ্রুত সেলাই-এর কল চলেছে,—তার একটানা সঙ্গীত শুনতে শুনতে আমার মন কখন সুদূর ক'লকাতায় চলে গিয়েছে! চৌরংগীর পাশে বিস্তৃত ময়দানে এতক্ষণ হয়তো শীতের পড়ন্ত রোদ্দুর শ্যামল ঘাসের উপর একখানা ফিকে সোনালী রঙের পাতলা মস্‌লিন বিছিয়ে দিচ্ছে, ব'সে ব'সে ভাবতে ভাবতে চোখ দু'টি

আমার আধোঘুমে ঢুলে এল, সারা সকাল পথে পথে ঘুরে শরীর ক্লান্ত হ'য়েই ছিল...... ক্রমে একটা কীর্ত্তনের সুর কোথা থেকে যেন কানে ভেসে আসছিল,

শতেক বরষ পরে
বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার হৃদয় উল্লাস—

কীর্ত্তনের গুণ্‌গুণ্‌ সুর। প্রেম-স্নিগ্ধ বাঙ্‌লার একান্ত নিজস্ব সুর।

...তন্দ্রার ঘোরে শুন্‌ছিলাম বহু, বহু দূরের শ্যামল বাঙ্‌লার নিভৃত পল্লীর কোন এক সার্থক-প্রতীক্ষ বিরহিনী আপন মনে গাইছে—

শতেক বরষ পরে
বঁধুয়া মিলল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস—

বড় মিষ্টি লাগছিল। উল্লাসের মধুর তরঙ্গ যেন আমার বুকের কিনারায় মৃদু মৃদু আঘাত দিচ্ছিল।

সম্মুখের শব্দমুখর সেলাই-এর কলের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমার সামনে থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেল।......

কন্‌কনে শীতের বাতাসের আকস্মিক ঝাপ্‌টায় তন্দ্রা ভেঙে গেল।......স্বপ্নের শ্যামল পল্লী থেকে রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে ফিরে এলাম,—সামনে সেলাই-এর কলের খট্‌-খট্‌ ধ্বনি, দিল্লীর চাঁদনিচক মহল্লার অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন গলি। কিন্তু গানের মৃদু গুঞ্জন তো বন্ধ হয়নি! আর এ যে সেই বাঙ্‌লার সম্পূর্ণ নিজস্ব সুর, বাঙলার কীর্ত্তন, এ তো ভুল হবার নয়!

তবে কি......

সন্ধ্যা নাগাদ সত্যি সত্যি আমার ওভার-কোট তৈরী হ'য়ে গেল। কিন্তু মন যে চায় না দর্জ্জির দোকান ছেড়ে চ'লে আসতে! পর্দ্দার অপর পারের দর্জ্জি-পত্নীকে আমি একটিবার দেখতে পেয়েছি—বোধ হয় সে ইচ্ছা ক'রেই আমাকে দেখা দিয়েছিল। ডাগর চোখ দু'টির সঙ্গে একবার মাত্র চোখোচোখি হ'তেই সে দৃষ্টি নত ক'রে নিয়েছিল।

ভুল হবার জো নেই! সে বাঙালিনী। বাঙলার রূপে-রসে গড়া বাঙালীর মেয়ে। নিয়তির কোন অপরিজ্ঞেয় ব্যবস্থাপনায় উত্তর-পাঞ্জাবের এক দর্জ্জির সঙ্গে পরিণীতা হ'য়ে, সে আজ পর্দ্দার আড়ালে পায়জামা আর ওড়নায়-ঢাকা পাঞ্জাবীবধূর রূপ নিয়েছে। শতেক বর্ষে কতবার তার চোখে বাঙলার স্বপ্নছবি ভেসে আসে, কে জানে?

হাইফা

অমিয় চক্রবর্ত্তী

হাইফার মেয়েটি
দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে মুখ ক'রে
এই দূর বন্দরে।
কখন
দেখ্‌লেম তার দৃষ্টিনির্ভর ক্ষণ।

চা খাচ্ছি, বেইরুট-যাত্রী, কাড়ল মন
ঢেউএর শব্দ-শোনা সুগন্ধি পাইন কাঠের বাতায়ন;
হোটেলটা খুলেচে মা বাপ মেয়ে—ইহুদি—বারুদাগ্নি য়ুরোপ হতে
পালিয়ে ঠেক্‌ল এই ডাঙায় বিপদের স্রোতে;
নূতন শিকড় পূর্ব্বপুরুষের দেশে। মেয়েটির মন তবু বাঁধা স্বপ্নের হিমে-
-ভরা কোন্‌ পশ্চিমে।
চলে যায় কখন
দৃষ্টিনির্ভর ক্ষণ

পেরিয়ে সাম্রাজ্যদর্পী জাহাজের উঁচু নাক, স্টীমার, মাস্তুল, জেটির জটলা
সাইপ্রাস থেকে সওদাভরা নৌকো, তেলের ট্যাঙ্ক, প্রকাণ্ড ক্রেনে মাল-তোলা,
পেরিয়ে কার্মেল গিরির গায়ে গায়ে বাড়ি, আঙুর-কমলা ক্ষেত, হিব্রু ভাষা,
বালিতে শক্ত-গড়া নবীন রাষ্ট্রিক তীব্র আশা,
নীল জল পেরিয়ে কখন
দৃষ্টিনির্ভর ক্ষণ

ছুঁল য়ুরোপের এল্‌ম্‌ গাছ, সেই রাইন, গির্জ্জে-চূড়ো গ্রাম,
সাদা বেড়া, স্কুলের বাগান, আর বন্ধু—মুছ্‌তে হবে যাদের নাম।
জাহাজ ফিরবে না, ট্রেন চলবে না যেদিক, ঢেকে দিল সম্পূর্ণ জীবন
একটি দৃষ্টিনির্ভর ক্ষণ॥

নব যৌবনের গান

হীরালাল দাশগুপ্ত

ছুটির ঘণ্টা বাজিল ঐ
দল বেঁধে মোরা ঘরেতে যাই,
শরীরে শরীরে গানের সুর
মৃত্যু-কঠিন মাটির গান।

চোখ দু'টো লাল—মদে মাতাল
দুই কাঁধে ভারী যুগের বোঝা,
আকাশে আকাশে ঝড়ের মেঘ
বাতাসে উড়িছে লাল নিশান।

মাটির বুকেতে গাঁইতি ঘা
বন্দী ইটের আর্তনাদ,
আকাশে মৃত্যু-মহোৎসব
বাতাসে উড়িছে লাল নিশান।

আয়রে ফাগুন আগুন-জ্বালা
দুনিয়াটা হোক আবীর-লাল,
শিরায় ছুটুক শোণিতধারা
আকাশে উড়ুক লাল নিশান।

আয় দুনিয়ার গৃহহারা আর
লক্ষ্মীছাড়ারা দল বেঁধে,
শক্ত মুঠিতে ধরিয়া হাতুড়ী
শত্রু দুর্গে মারিব ঘা।

সংরক্ষিত সর্বস্বত্ব
শয়তান করে স্বর্গ ভোগ,

শ্রমিকেরা হও সংঘবদ্ধ
কাস্তে-কামান সংগ্রামে।

মাটির বুকেতে গাঁইতি ঘা
বন্দী ইটের আর্তনাদ,
আকাশে মৃত্যু-মহোৎসব
বাতাসে উড়িছে লাল নিশান।

বসন্ত বিলাপ

প্রমথনাথ বিশী

মানুষের ঘরে ছিল একদা
জানি সে কথা
হৃদি-সিকতা
সিক্ত—আজো।

মানুষের ঘরে ছিল সে নারী
হৃদয় কাড়ি'
গিয়েছে ছাড়ি;
রিক্ত—আজো
মানব-হৃদয় রিক্ত আজো।

দুখের দ্রাক্ষা ফেটেছে মুখে
সে রস ঢুকে,
জীবনে, বুকে,
তিক্ত—আজো
মানব-জীবন তিক্ত আজো।

মিলনের মধুচক্র গত,
মধুপ যত

স্বপ্ন মতো
পৃক্ত—আজো
মন-শাখে সংপৃক্ত আজো।

সুখ গেছে তবু স্মৃতি-শকুন
ছাড়ে না তৃণ ;
একি দারুণ
রিক্থ—আজো
অনাদি আদিম রিক্থ আজো।

বিরহে মিলনে সন্ধি হবে
আর কি ভবে
হায় রে কবে ?
ঠিক্ তো—আজো
ধরণী তেমনি ঠিক্ তো আজো।

তেমনি পড়িয়া সকলি আছে।
কানের কাছে
বকুল গাছে
পিক তো—আজো
তেমনি ডাকিছে পিক তো আজো ॥

ঝড়ের আকাশ

বিশ্বনাথ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পেট্রলের গন্ধের একটা মোহ আছে। ধূসর সহর, ট্রাফিক আর কর্ম্মব্যস্ত জনতা। তবু সহর ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়। অনাত্মীয় আবহাওয়ার প্রতি কৃষ্ণার একটা স্বাভাবিক সঙ্কোচ আছে, আর তা ছাড়া এতদিন সে শুধু চ'লে যাবার আয়োজনই করেছে, কলকাতা তাকে সত্যি-সত্যিই ছেড়ে যেতে হবে—একথা সে একবারও ভেবে দেখেনি।

আসানসোল অবিশ্যি যায়গা মন্দ নয়, আর সেখানকার স্কুলটিও ভাল, সে শুনেছে। তবু তার মনে হলো, এখানেই যেন সে সব-কিছু রেখে যাচ্ছে। একটা টিউশনি যদি সে পেত তাহ'লে হয়ত বা থাকা সম্ভব হ'তো তার।

একদিন সে এমনি নিরুপায় হয়েই জয়ন্তর কাছে চিঠি লিখেছিল। আজও হয়ত লিখলে সে আসে,—কিন্তু আর নয় ; যে ভুল বুঝে মিথ্যার বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে এখনও তাকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে,—তাকে আর সে কোন-কিছুতে জড়াতে চায় না।

কৃষ্ণা মনে-মনে ভেবে দেখলে, জয়ন্ত চিরদিনই তাকে করুণার চোখে দেখে এসেছে। সে নিতান্ত অসহায় ব'লে চিরদিন সাহায্য ক'রে এসেছে—কৃষ্ণার মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে যখন সে একথা মনে করে। কেন সে আগে বুঝতে পারে নি ? নিজের বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়েও তার আপশোষ যায়না। শেষপর্য্যন্ত করুণা নিয়েও তাকে বেঁচে থাক্‌তে হ'লো ! তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে ? শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা ? জয়ন্তর কথাগুলো কত অন্তঃসারশূন্য ! ঠিক তাদের ড্রয়িংরুমে-সাজানো Flower-vasএ কৃত্রিম গোলাপগুচ্ছের মত।

কৃষ্ণা ভাবলে, সে গরীব ব'লেই জয়ন্ত তাকে অপমান কর্‌তে সাহস করলে, —বড়লোকরা যা চিরদিন ক'রে থাকে। রমলা সম্বন্ধে একটা কথাও ত সে মনে করেনি এতদিন। জয়ন্ত তাকে পড়ায়, সে তা জান্‌তো। তবু তা নিয়ে একটা কথাও হয়নি তাদের। জয়ন্ত রমলাকে বিয়ে করবে একথা শুনেও প্রথমে সে বিশ্বাস কর্‌তে চায়নি কিন্তু সে বিয়েতেই তাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে—মাসিমার সানুনয় অনুরোধ, হলদে রঙের কাগজে লাল হরপে লেখা ; আর অবিশ্বাস করা চলে না।

জয়ন্ত সাহস ক'রে আসেনি—এলে ভাল করতো। অন্ততঃ তার সম্বন্ধে এতটা নীচ ধারণা নিয়ে তাকে চ'লে যেতে হতো না—এটুকু দুঃসাহস থাকা উচিত ছিল তার।

জয়ন্ত হয়ত ভাবছে কৃষ্ণা এ-আঘাত সহ্য করতে না পেরে মুসড়ে পড়বে, হয়ত আত্মহত্যা করবে—অসম্ভব কি? পুরুষেরা যা ভেবে আনন্দ পায় আর জয়ের গর্ব্বে—উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। কিন্তু জয়ন্তকে সে-গর্ব্বের মোহ থেকে রক্ষা করতে হবে।

কৃষ্ণা শেষপর্য্যন্ত বিয়েতে উপস্থিত হবে মনে-মনে ঠিক ক'রে ফেললে। কেন, তার হয়েছে কি? পৃথিবীতে প্রেমই ত সব নয়, আর তাছাড়া তার প্রেমই যে সত্য তারই বা মানে কি আছে? হয়ত সে এতদিন ভুল বুঝে এসেছে—নিজের মনকেও হয়ত সে ভাল ক'রে জানতে পারেনি। একটা মোহে আচ্ছন্ন হয়ে সব ক'রে গেছে। মোহ কেটে গেছে—এখন সব পরিস্কার।

ক্রমশঃ রোদ বারান্দা পার হ'য়ে ঘরে এসে ঢুকেছে। হস্‌টেলের নিস্তব্ধ আব-হাওয়া আর ভাল লাগেনা। গ্লোবে উদয়শঙ্কর। কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি বেরোবার জন্যে প্রস্তুত হ'লো। কি ভেবে ব্যাগ হাতে নিয়ে একবার খুলে দেখলে। আসানসোল যাবার খরচ বাদে মাত্র দশ আনা সম্বল। শেষপর্য্যন্ত মত পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হলো সে।

বুকের নীচে একটা বালিশ নিয়ে একটা-কিছু লেখার চেষ্টা করলে। খাতা-পত্রের মধ্যে তার অসমাপ্ত প্রবন্ধটা চোখে পড়লো—জয়ন্তর অনুরোধে যা একদিন সে লিখতে আরম্ভ করেছিল। কি ভেবে সে-কাগজগুলো হাতে নিয়ে সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে রইলো। তারপর পাতাগুলো ছিঁড়ে ফেললে। জয়ন্তকে মনে পড়তে পারে এমন-কোন জিনিষই আর সে কাছে রাখবেনা।

কৃষ্ণা শ্রান্তভাবে বিছানায় শুয়ে পড়লো—ঘুম কি তার আর আসবে?

অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। আচ্ছন্নের মত সে চোখ তুলে তাকাল। চোখের কোণটা ভিজে—বালিশটাও ভিজে গেছে অনেকখানি। নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হ'য়ে অপরাধীর মত বালিশটা বিছানার নীচে লুকিয়ে ফেললে।

পরের দিন সকালে উঠে কৃষ্ণা ভাবলে, আজকেই তার আসানসোল চ'লে যাবার কথা। কিন্তু আজ আর যাওয়া হয় কই! রমলার বিয়ের নেমন্তন্ন তাকে রক্ষা করতে হবে—বাসরঘরে জয়ন্তর কাছে শেষ বিদায়ও নেওয়া যাবে। ভাবতেও বেশ রোমান্টিক লাগছে। Rebecca কি আয়েষার অভিনয়—মন্দ কি! আঁচল দিয়ে চোখটা মুছে কৃষ্ণা আপন মনেই হেসে উঠলো।

আকাশে ধূসর মেঘ। অনেকদিন পরে ঠাণ্ডা হাওয়াটা বেশ লাগছে। একটু

পরেই মেঘ কেটে গিয়ে ফর্সা ধারালো রোদের অজস্রতা, কিন্তু তাও বেশী সময়ের জন্যে নয়। সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কৃষ্ণা প্রস্তুত হ'লো সাদাসিদে একখানা শাড়ী প'রে। বাসরুটের শেষ সীমানায় বাড়ী। নম্বর ঠিক করতে বেগ পেতে হলো না। উৎসবের আলো ইসারায় তাকে কাছে টেনে নিলো।

সম্মুখের প্রাঙ্গনে টেবিল আর চেয়ার সাজানো। দু'পাশে ক্রোটন গাছের সারি। সভার এক কোণে একটি বেদী রচনা করা হ'য়েছে—ফুলে আর পাতায় সমস্তটাই ঢাকা।

এখনও বেশী ভিড় হয় নি। কৃষ্ণা এক পাশ দিয়ে ওপরে উঠে এলো। তাকে কেউ চিনতে পেরেছে ব'লে মনে হ'লো না। অনেক অপরিচিত মুখ—কে-ই বা কাকে চেনে? হেমলতা দূর থেকে দেখতে পেয়ে তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে এগিয়ে এলেন, 'এসো মা, কত খুশী হ'লাম তোমায় দেখে।' তারপর চিবুকে হাত দিয়ে একটু আদর ক'রে বললেন, 'আহা কি চেহারাই হ'য়েছে, একটুও সারতে পারোনি দেখছি।'

কৃষ্ণা একটু ম্লান হেসে নত হ'য়ে প্রণাম করলো, মাথায় হাত দিয়ে হেমলতা বললেন, 'আশীর্ব্বাদ করি মা, সুখী হও। তোমার যেন এমনি ক'রেই বিয়ের ফুল ফোটে।'

চোখ তুলে কৃষ্ণা বললে, 'এটা ঠিক আশীর্ব্বাদ হ'লো না মাসিমা।' তারপর অশোকের দিকে ফিরে বললে, 'কি বলেন মিঃ রায়—এসব আমাদের মানায় না?'

'আমি কি বলবো বলুন?' অশোক একটু হেসে বললে।

'ভয় নেই, আপনাকে দলে টানছি না তাই ব'লে।'

'ভরসাই বা পাই কি ক'রে বলুন? আমাদের কারও ভাল-লাগার ওপরে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। ভাল লাগবে না অথচ বিয়ে করবো—এরকম অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য অন্ততঃ আমাকে দিয়ে হবে না।'

'আপনি ত আমার সেই বান্ধবীর মত বলছেন দেখছি। কোন ছেলেকে বেশী দিন ভাল লাগলো না ব'লে আজ পর্য্যন্ত সে বিয়ে করতেই পারলে না। একজনকে যে আপনার চিরদিনই ভাল লাগবে তারই বা কি বিশ্বাস আছে মিঃ রায়?'

'কি সব অনাসৃষ্টি তর্ক!' হেমলতা অস্ফুট-কণ্ঠে কথাটা বললেন কিন্তু দু'জনারই কানে গেল।

কৃষ্ণা হেসে বললে, 'তাহ'লে চুপ করতে হলো।'

আরতি একরাশ ফুল হাতে ক'রে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। কৃষ্ণাকে দেখে বললে, 'এগুলো একটু ধরোনা কৃষ্ণাদি, আমি আঁচলটা পিন্ ক'রে নি।'

আরতির কবরীতে একটা মালা জড়িয়ে দিয়ে কৃষ্ণা বললে, 'তোকে দেখে

অনেকেই কিন্তু ঠিক করতে পারবে না, তবে জয়ন্তবাবুর ভুল করবার ভয় নেই এই যা—কিন্তু লোভ সামলানোও কঠিন। ইচ্ছা ক'রে ভুল ক'রে বসতেও পারেন।'

'যাও, ছোট বোনকে এইসব বলে না কি?' আরতি পালাতে যাচ্ছিল, কৃষ্ণা তার একটা হাত ধ'রে বল্‌লে, 'তাই ত, এইবার গম্ভীর হ'তে হবে দেখছি।—রমলা কোথায় রে?'

'দিদি তোমার সাম্‌নে লজ্জায় আস্‌ছে না; ওঘরে চুপ ক'রে ব'সে আছে।'

'তাই নাকি?' কৃষ্ণা সেই দিকে এগিয়ে গেল। বারান্দার এক পাশে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে নিজেকে অনেকটা ঠিক ক'রে নিলে। কিন্তু আর নয়, নিজের ওপরে আর তার বিশ্বাস নেই। এইবার সে পালাবে।

পাছে সামান্য একটু ত্রুটি থেকে যায় তাই শেষপর্য্যন্ত কৃষ্ণা রমলার কাছে এলো। রমলা কিন্তু চোখ তুলে তাকাতে পার্‌লো না। কৃষ্ণা তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে, 'ছিঃ আজকের দিনে চোখে জল কেন রমলা?'

রমলা মাথাটা কৃষ্ণার মুখের কাছে সরিয়ে নিয়ে শিশুর মত কাঁদতে লাগলো। অনেকক্ষণ পরে চোখ তুলে বল্‌লে, 'আমায় তুমি ক্ষমা কোরো না কৃষ্ণাদি, বরং অভিশাপ দিও। তোমার অভিশাপ কুড়িয়েও যদি একটু সান্ত্বনা পাই।'

'কিন্তু রমলা আমি ত এতটা নীচ হতে শিখিনি, তাই তোমায় আশীর্ব্বাদই ক'রে গেলাম।' কৃষ্ণা আঁর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়ালো না। আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা ক'রলে হয়তো তার পক্ষে চ'লে যাওয়া অসম্ভব হবে।

জয়ন্তর বাসরঘরটা ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। বিদায় নেবার দৃশ্যটা না হয় অসমাপ্তই থেকে যাক্‌। এতটা গর্ব্ব থাকাও ভাল নয়, কৃষ্ণা মনে-মনে বল্‌লে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে হেমলতার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। কৃষ্ণা নম্রভাবে বল্‌লে, 'ভেবেছিলাম থেকে যাবো মাসিমা, কিন্তু কালকে আমাকে চ'লে যেতে হচ্ছে। জিনিষ গুলো একটু গুছিয়ে নিতে হবে, ছোটখাটো আরও দুএকটা কাজ পড়ে আছে।'

'চ'লে যাবে? কোথায়?' হেমলতা একটু উৎসুক ভাবে প্রশ্ন কর্‌লেন।

'কলকাতার বাইরে একটা স্কুলে কাজ পেয়েছি।'

'তা বেশ। একটু-কিছু মুখে দিয়ে গেলে না?'

'অসুখের পরে আমি ত এসব কিছু খাই না মাসিমা,—ওর জন্যে আপনি কিছু মনে করবেন না। এর পরে একদিন পেটপুরে খেয়ে যাবো।' —কৃষ্ণার মুখে ম্লান হাসি—সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে কৃষ্ণা বল্‌লে।

গেট পার হ'য়ে রাস্তায় নেমেছে। অশোক দেখ্‌তে পেয়ে কাছে এসে বল্‌লে,

'আপনি এখুনি চ'লে যাচ্ছেন?'

'তাই ত মনে করছি।' কৃষ্ণা অন্যমনস্কভাবে বল্‌লে।

'চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।' অশোক গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিলে।

'আপনি আবার কষ্ট করবেন?'

'আপনাকে একা যেতে দিলেও খুব ভদ্রতা হবে না, আশাকরি।'

'বেশ।' কৃষ্ণা আর কিছু বল্‌লে না, গাড়ীতে উঠে বস্‌লো।

হঠাৎ বাতাস বন্ধ হ'য়ে গেল নাকি? কৃষ্ণা মুখটা হুডের বাইরে রেখে রাস্তার আলোর দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। অশোক বল্‌লে, 'জানেন, জয়ন্তবাবুর এ-বিয়েতে মত ছিল না?'

'কেন?'

'তা বল্‌তে পারবো না, তবে প্রথমটায় যথেষ্ট আপত্তি ক'রেছিলেন।'

'তারপর?' কৃষ্ণা অন্যমনস্কভাবে বল্‌লে।

'মিসেস্ দে'র জেদ,—শেষপর্য্যন্ত জয়ন্তবাবু মত দিতে বাধ্য হ'য়েছেন শুনলাম। যাক্ আমিও নিশ্চিন্ত। মুক্তি পেলাম এতদিনে।'

কথাটা যেন কৃষ্ণা বুঝ্‌তে পারেনি এমনি ভঙ্গিতে বল্‌লে, 'আপনি নিশ্চিন্ত? তার মানে?'

'রমলার বিয়েতে একটা যৌতুক দেবার কথা ছিল—বাবা মারা যাবার সময় কথা দিয়েছিলেন। শেষপর্য্যন্ত বাড়ীখানা লিখে দিতে হ'লো। মিসেস দে'র সে-বিষয়েও পাকা বুদ্ধি দেখলাম, নিজের নামেই লিখিয়ে নিলেন।'

'হ্যাঁ, সুগৃহিনী ব'লে ওঁর সুনাম আছে।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অশোক আবার বল্‌লে, 'আপনি হয়ত জানেন না আপনাকে ভুল্‌তে আমার অনেক সময় লেগেছিল।'

'অতটা দীর্ঘসময় লাগা উচিত হয়নি, কি বলেন?' কৃষ্ণা গম্ভীর ভাবে বল্‌লে।

'তা নয়, আমার মনে হ'তো আপনি এত কম কথা বলেন যে কোন-কিছুই জানা যায় না—দূর থেকে হয়ত আপনার মনের নাগাল পাবো।'

'আপনি ত জয়ন্তর কথা জান্‌তেন অশোকবাবু।'

অশোক যথেষ্ট লজ্জিত হ'য়ে বল্‌লে, 'না সেজন্য নয়—আপনি যেন ভুল বুঝ্‌বেন না আবার। বিশ্বাস করতে পারেন, আমার মধ্যে আর infection নেই।'

'ভুল বুঝ্‌তে পারি কিন্তু ভুল করার আর ভয় নেই মিঃ সেন, কিন্তু infection-এর কথা কি বল্‌ছিলেন?'

'সেন্টিমেন্ট্‌স-এর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি।' অশোক একটু হাসির চেষ্টা করলে।

'তাই নাকি? তবু আশ্বস্ত হ'লাম শুনে।' কৃষ্ণা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে।

হু-হু শব্দে মটর ছুটেছে। আবার অনেকক্ষণ কোন কথা নেই। ষ্টিয়ারিংটা ঘুরিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধ'রে অশোক বললে, 'য়ুরোপ থেকে আপনার জন্যে যা পাঠিয়েছিলাম তা আপনার কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল কি না সে-খবরও পাইনি।'

'নিশ্চয় পৌঁছেছিল। আপনাকে সেজন্যে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ সেন। আর তারই জের টেনে বলছি, আপনি আমাকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন।'

'তার মানে?'

'আপনার জিনিষ রমলারই কাজে লাগবে মনে হ'লো—তাই তাকে দিয়ে এসেছি।' সংক্ষেপে কৃষ্ণা শেষ করলো।

পাশাপাশি দু'টি নিঃশব্দ মন একটু নির্জ্জনতা খুঁজছিল। ঝড়ের বেগে মটর ছুটেছে, গাছের ফাঁকে-ফাঁকে আলোর ঝিলিমিলি।

কৃষ্ণা বললে, 'ভয়ানক মাথা ধরেছে মিঃ সেন। গাড়ীটা এবার ঘুরিয়ে নিন!'

'ঠাণ্ডা বাতাস আপনার ভাল লাগবে, আর একটু চলুন।' অন্যমনস্ক ভাবে অশোক বললে।

গাড়ীতে যে তেল নেই এতক্ষণ জয়ন্তর তা খেয়ালই ছিল না। কৃষ্ণাকে হস্টেলে না পেয়ে এলোমেলো ভাবে অনেক পথ সে ঘুরেছে। রিচি রোড পার হ'য়ে একটা পেট্রল-পাম্পের সামনে গাড়ীটা থামিয়ে জয়ন্ত নেমে পড়লো।

আর আশ্চর্য্য! একটু আগে যে সোয়ালো গাড়ীখানা এখান থেকে বেরিয়ে গেছে তার দিকে জয়ন্ত একাগ্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো। নম্বরটা তার বিশেষ পরিচিত। মিঃ সেনের পাশে ব'সে যে-মেয়েটি অসঙ্কোচে অনেক কথা ব'লে যাচ্ছে তাকে দূর থেকে দেখলেও জয়ন্তর চিনতে একটুও কষ্ট হ'লোনা।

'এই বেশ হ'লো।' জয়ন্ত মনে-মনে বললো। কিন্তু কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাকে টানছে। ফিরে যেতে চাইলেও আর উপায় নেই। কৃষ্ণার কাছে পরাজয় স্বীকার করবার অপমান থেকে সে বাঁচতে চায়। জয়ন্ত গাড়ীর গতি আরও বাড়িয়ে দিলে। পিছনে সহরের শেষ চিম্‌নিটা প'ড়ে রইলো। উদ্দাম গতিতে মটর ছুটেছে। দু'পাশে আম গাছের সারি।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি জয়ন্তকে রক্ষা করেছেন। রমলাকে বিয়ে ক'রে সে একটা ভুল করতে যাচ্ছিল কিন্তু সে-ভুল সংশোধন করতে গিয়ে সে যে আবার একটা

মারাত্মক ভুল ক'রে বসেনি এই ভেবেই সে মনে-মনে খুসি হলো। কৃষ্ণাকে সে বুঝিয়ে দেবে অভিনয় করার মত মূলধনও তার বিশেষ-কিছু নেই। অশোকের জন্যে তার দুঃখ হয়। য়ুরোপ ঘুরে এসেও তার স্নায়ুগুলো যথেষ্ট সুস্থ হয়নি।

যশোর রোড ধ'রে গাড়ী চলেছে। জয়ন্ত মনে-মনে ভাবলে এইবার তার ফেরা উচিৎ। এর পরেও আর কি জানবার আছে? এই কি যথেষ্ট নয়!

রাস্তা এখানে অনেকখানি উঁচু। দু'পাশে গভীর খাদ। জয়ন্তর মনে হলো গাড়ীটা একটু জোরে চালিয়ে একবার সে মুখোমুখি দেখবে। কৃষ্ণাকে অন্ততঃ বুঝিয়ে দেবে তার নিশীথ অভিসারের পক্ষে যশোর রোডও যথেষ্ট নির্জ্জন নয়।

অন্যমনস্কভাবে ষ্টিয়ারিং ঘোরাতে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই গাড়ীটা উল্টে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বাতাসে মিলিয়ে গেল।

অশোক গাড়ীটা থামাতেই কৃষ্ণা ব্যাকুল ভাবে বললে, 'কি হলো মিঃ সেন?'

'নেমে আসুন, আমাদের পিছনের মটরখানা উল্টে গেছে মনে হলো।'

অশোকের পিছনে কৃষ্ণা ভয়ে-ভয়ে নেমে এলো। কাছে এসে কৃষ্ণা চমকে উঠলো: 'জয়ন্ত!'

জয়ন্ত শেষবারের মত চোখ মেলে তাকালো। কৃষ্ণাকে মুখোমুখি পেয়েও কোন কথা তার বলা হ'লো না।

জয়ন্তর নিস্পন্দ অসাড় দেহখানা কোলে ক'রে রাত্রির শীতল অন্ধকারের দিকে কৃষ্ণা বোবাদৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো। দূরে বহু পুরাতন বট গাছটায় বাদুড়ের ডানা-ঝাপটানো শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

দুর্ঘটনাটা এতই অভাবনীয় এবং মর্ম্মান্তিক যে, অশোক বিমূঢ়ের মত চুপ ক'রে ব'সে রইলো—মুখ দিয়ে তার একটা অস্ফুট শব্দ পর্য্যন্ত বের হলোনা।

পরের দিন সকালেও কৃষ্ণা দরজা খুললো না। হস্টেলের প্রায় সকলেই এর মধ্যে তার খোঁজ ক'রে গেছে, কিন্তু কেউই কোন সাড়া পায়নি। কী কথা বলার আছে কৃষ্ণার? —কার ডাকে সে সাড়া দেবে?

হাতের মুঠোর মধ্যে চিঠির অক্ষরগুলো তখনও বন্দী। কৃষ্ণা আর একবার প'ড়ে দেখলো:

"তুমি লিখেছ দুর্ব্বলতাকে তুমি জয় করতে শিখেছ, আর কারও বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিযোগ নেই। কিন্তু আমার অধিকারকে অস্বীকার করবার সাহস তুমি কবে থেকে ফিরে পেলে কৃষ্ণা, একবার কষ্ট [illegible] জানাবে কি?

"রমলার সম্বন্ধে তুমি ভুল ধারণা করেছ। আমাকে পেলে সে একটুও সুখী হবেনা—পাশের বাড়ীর অমিয়কে বরং সে সহ্য করতে পারবে কিন্তু আমাকে নয়। তুমি ভাব্‌ছো—অবিচার করছি ? মোটেই নয়। তুমি কি আমাকে অভিনয় করতে বলো ?

* * * *

"আর নয় রাহু, বিয়ের রাতে বর-পালানোর খবর না-হয় কাল খবরের কাগজে প'ড়ো, কিন্তু তার আগে এসো দুজনায় বেরিয়ে পড়ি—তুমি আর আমি।........"

সার্সি ভেঙে রোদ্‌ এসেছে। আকাশে নীল মেঘের আস্তরণ। কে ! —জয়ন্ত ডাক্‌লো না !

চিঠিটা বুকের নীচে রেখে, দৃঢ় মুঠিতে চেয়ারটা চেপে ধ'রে কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল।

(সমাপ্ত)

'পড়শী' চিত্রের (প্রভাত [illegible]) একটি অপূর্ব দৃশ্যে .
অনীশ ও বলবন্ত সিং

'পুনর্মিলন' চিত্রে (বম্বে টকীজ) শ্রীমতী স্নেহপ্রভা"
চমৎকার অভিনয় করেছেন

পত্রিকা : মাঘ, ১৩৪৭